# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা


## সাদ্দাম নয়, বিচার হোক যুদ্ধাপরাধী বুশ-ব্লেয়ারের

— নীহার মুখার্জী

দখলদার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দ্বারা গত ১৩ ডিসেম্বর বেআইনিভাবে ধৃত ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেনের মুক্তি এবং ইরাক থেকে অবিলম্বে ইঙ্গ মার্কিন সৈন্য অপসারণের দাবি করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন, সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকে খোলাখুলি লঙ্ঘন করে যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোট বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বে ইরাকের ওপর নগ্ন আক্রমণ চালিয়ে গোটা দেশ দখল করেছে, তাদের কোনভাবেই সাদ্দাম হুসেনের বিচার করার কোনও নৈতিক অধিকার নেই। বরং যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার হওয়া উচিত বুশ-ব্লেয়ারেরই। কারণ, তারাই ঔপনিবেশিক দখল কায়েম করার হীন মতলবে ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ চালিয়েছে এবং শিশু-নারী সহ হাজার হাজার ইরাকিকে হত্যা ও পঙ্গু করেছে।

সাদ্দাম হুসেনকে গ্রেপ্তারের মত ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা করে এবং অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে এই ঘৃণ্য কাজের প্রত্যুত্তরে ইরাকের যে বীর জনগণ সাহসের সঙ্গে রাস্তায় নেমেছেন এবং প্রতিরোধ সংগ্রামকে তীব্রতর করেছেন, তাঁদের প্রতি সার্বিক সংহতি প্রকাশ করে কমরেড নীহার মুখার্জী পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন যে, ইরাকের মাটি থেকে অবিলম্বে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে অপসারণ করতে হবে। সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, শুধু ইরাক ত্যাগে বাধ্য করতেই নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মরণ আঘাত হানতে ইরাকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়ান।

### সি ই এস সি-তে ছাঁটাই প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে

## ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র চিঠি

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানির ৪৩৭২ জন কর্মীকে স্বেচ্ছাবসরের নামে কার্যত ছাঁটাই করার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হস্তক্ষেপ দাবি করে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং অল ইণ্ডিয়া পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড শংকর সাহা ১৫ ডিসেম্বর একটি চিঠি দেন। এই চিঠিতে কমরেড সাহা বলেন সি ই এস সি কর্তৃপক্ষ রুগ্নতার যুক্তিতে মুলাজোড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়ে ঐ কেন্দ্রের ৪৩৭২ জন কর্মীকে উদ্বৃত্ত হিসাবে ছাঁটাই করতে চায়। যে লোকসানের যুক্তিতে এই ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা, সেই লোকসানের যুক্তি দেখিয়েই সি ই এস সি-র কাছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পাওনা ২০৪.৬৯ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়ে মকুব করিয়ে নিয়েছে সি ই এস সি কর্তৃপক্ষ। যাকে ২০০২ সালে প্রকাশিত 'ক্যাগ'-এর অডিট রিপোর্ট বলেছে 'এটি রাজ্য সরকারের অনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা'। এর পর সি ই এস সি কর্তৃপক্ষ তাদের ক্রমবর্ধমান

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

### মদের লাইসেন্স, খাজনা, ধানের দাম, পঞ্চায়েতি কর

# জানুয়ারিতে আন্দোলনে নামছে এস ইউ সি আই

## সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষের ঘোষণা

বিপুল সংখ্যায় মদের দোকানের লাইসেন্স বিতরণ, বহুগুণ খাজনা বৃদ্ধি, গরিব চাষীর ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়া সহ গ্রামীণ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে জানুয়ারি মাসে জেলাস্তরে বিক্ষোভ, আইন অমান্য, সরকারি দপ্তর ঘেরাও এবং ফেব্রুয়ারিতে লক্ষাধিক মানুষের রাইটার্স অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কর নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড গোপাল কুণ্ডু সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ইতিমধ্যেই সরকার বিপুল হারে স্কুল-কলেজে ফি বৃদ্ধি ও হাসপাতালে চার্জ বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোথায় কোথায় জনগণের ঘাড়ে নতুন করে কর বসানো যায় তা খুঁজে বের করা। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে মোটর সাইকেল, স্কুটার, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি, ভ্যানগাড়ি, গরুর গাড়ি, বাইসাইকেল, ঘরের গরু ছাগল সহ অন্যান্য পশুপাখি, মেলা ও দেবস্থানেও কর বসিয়ে মধ্যবিত্ত এবং গরিব মানুষের উপর এক নতুন আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। এমনকি গরু ছাগল পঞ্চায়েতের জমির ঘাস খেলেও কর দিতে হবে। তিনি বলেন, সি পি এম-ফ্রন্ট শাসনে সঙ্কটে জর্জরিত মানুষের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। তিনি বলেন, 'টাকা নেই' — এই অজুহাতে তারা ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স দিচ্ছে যার উদ্দেশ্য কেবল টাকা তোলা নয়, সেই সাথে মাদকাসক্তির প্রসার ঘটিয়ে দেশের ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদী চরিত্রকে পঙ্গু করে দেওয়া। তিনি বলেন — আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি ছিল মাদকদ্রব্য বর্জন। চীনে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনেও আফিংয়ের নেশা বর্জনের জন্য কমিউনিস্টরা লড়েছিল। অথচ, এখানে বামপন্থার নামে সি পি এম কী করছে ? অপসংস্কৃতির ঢালাও প্রচার চলছে, ক্যাবারে-পর্নোগ্রাফিতে গ্রাম-শহর ছেয়ে গিয়েছে, নতুন করে আরও তিন হাজার মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে গ্রামে প্রতি আঠারো হাজার এবং শহরাঞ্চলে প্রতি বারো হাজার লোক পিছু মদের দোকানের ব্যবস্থা থাকে। তার ওপর যাতে কিশোররাও মদে অভ্যস্ত হয় তাই নরম পানীয়ে অল্প মদ মিশিয়ে প্রকাশ্যে খোলা বাজারে চা, পান, এমনকি স্টেশনারি দোকানেও বিক্রি করার ব্যবস্থা করছে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার।

তিনি বলেন, সরকার মনে করে সরকারের টাকা নেই, যেন জনসাধারণের অঢেল আছে। আসলে জনসাধারণ কী অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে সরকারের কোনও ধারণাই নেই। এই সরকার জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের টাকা নেই কেন ? সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার মালিক-পুঁজিপতিদের যত কর ছাড় দিয়েছে

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

## সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

*২০ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশের একাংশ। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন। (সংবাদ আগামী সংখ্যায়)*

# বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন

## দার্জিলিং

৬ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির রেড ক্রস হল-এ দার্জিলিং জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মৃণাল কান্তি ঘোষ। কালিম্পং থেকে আগত প্রতিনিধি ভবেশ দাস বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য অমল মাইতি। তিনি বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অধ্যাপক মৃণাল কান্তি ঘোষকে সভাপতি এবং শংকর পালকে সম্পাদক করে ৪০ জনের নূতন কমিটি গঠিত হয়।

## মুর্শিদাবাদ

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর বহরমপুর গ্রান্ট হলে মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বাণী ইস্রায়েল। সৌমেন দাসের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভা পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন ইয়াকুব সেখ, বাপী ঘোষ, প্রশান্ত চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ দাস। সভায় মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সুভাষচন্দ্র দাস। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন জেলা সম্পাদক কুণাল বিশ্বাস। সমর্থন করেন আনিসুল আম্বিয়া। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ বিদ্যুৎ গ্রাহক শ্রীপদ হালদার, প্রবীণ শিক্ষক সত্যনারায়ণ ব্যানার্জী, প্রবীণ শ্রমিক নেতা নবকৃষ্ণ চ্যাটার্জী ও বাপী ঘোষ। সভার প্রধান অতিথি প্রশান্ত বাগচী বলেন, বিদ্যুৎগ্রাহকদের উপর যে আক্রমণ নেমে এসেছে তার প্রতিবাদে গ্রাহক সমিতি যে আন্দোলন করছে, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমরা এই আন্দোলনের পাশে থাকব। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অমল দাস, মতিউর রহমান, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষে বাণী ইস্রায়েলকে সভাপতি, কুনাল বিশ্বাসকে সম্পাদক, দ্বারক ঘোষ ও রুস্তম চৌধুরীকে যথাক্রমে অফিস সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ করে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনের পর গ্রান্ট হল ময়দানে শুরু হয় প্রকাশ্য সভা। প্রধান বক্তা কুণাল বিশ্বাস বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু করেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতি দ্রুত তাকে কার্যকরী করতে চলেছে। এই আইন কার্যকরী হলে বিদ্যুৎশিল্প সম্পূর্ণরূপে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করা হবে। সাধারণ গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম ব্যাপক বাড়বে, সমস্ত ভর্তুকি উঠে যাবে এবং বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আদালতে বিচার চাইবার অধিকার থাকবে না। তিনি জনবিরোধী বিদ্যুৎ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রকাশ্য অধিবেশন শেষে ইসলামপুরের সংকেত গোষ্ঠী 'হরিপদর স্বপ্নভঙ্গ' নাটকটি পরিবেশন করেন।

এই সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন।

## হুগলি

গত ৩ ও ৪ ডিসেম্বর হুগলি জেলা সদর চুঁচুড়ায় অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) দ্বিতীয় হুগলি জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ ডিসেম্বর ঘড়ির মোড়ে প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মৃণালকান্তি রায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের প্রাক্তন ডিরেক্টর অমলেন্দু ভট্টাচার্য। সভায় মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অ্যাবেকার হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। সভাপতি তাঁর ভাষণে অ্যাবেকাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং বলেন একমাত্র অ্যাবেকাই বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও গ্রাহক স্বার্থে আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনের ফলেই বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করা গেছে। প্রধান অতিথির ভাষণে অমলেন্দুবাবু বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, প্রয়োজনে ভরতুকি দিয়েও সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে হবে। তিনি বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর তীব্র সমালোচনা করেন। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙে তিনটি কোম্পানি তৈরি করারও তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন প্রত্যেক কোম্পানিকে ১৬% লাভ করতে দিলে মোট লাভের পরিমাণ হবে প্রায় ৫০%, অথচ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের লাভ করার কথা ৩%। ফলে বিদ্যুতের দাম অনেকটাই বাড়বে।

অ্যাবেকার রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শিবাজী দে।

৪ ডিসেম্বর চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দু'শ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের শেষে কমলকৃষ্ণ মল্লিককে সভাপতি ও প্রদ্যুৎ চৌধুরীকে সম্পাদক করে ৫৮ জনের জেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সম্মেলন শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিরা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন।

# ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র চিঠি

*একের পাতার পর*

টি অ্যাণ্ড ডি লস, বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ সহ সামগ্রিক যে হিসাব দেখাচ্ছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী বিদ্যুৎ শিল্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ শংকর সেন এই হিসাব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন বলেই সি ই এস সি'র সঙ্গে তাঁর সংঘাত ঘটেছিল।

৪৩৭২ জন কর্মীকে ছাঁটাই করতে পারলে সি ই এস সি কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি মাশুল ১০ পয়সা কমিয়ে দেবে বলে যে প্রচার করছে তা একটি প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। কর্মী ছাঁটাই হলে জনমানসে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে তা প্রশমিত করতে ও জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের বিচ্ছিন্ন করতে এই ছাড় দেওয়ার টোপ, যা মালিকদের চিরাচরিত এক দুরভিসন্ধিমূলক কৌশল।

সি ই এস সি কর্তৃপক্ষ কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাই, মুলাজোড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া ও পার্কসার্কাস সেন্ট্রাল স্টোর্স তুলে দেওয়ার যে কারণ দেখাচ্ছে তা কতটা যুক্তিযুক্ত ? নাকি এই মূল্যবান জায়গায় তাদের অন্য কোনও ব্যবসা করার পরিকল্পনা আছে তা যাচাই করে দেখা জরুরি। এই চিঠিতে তিনটি দাবি তুলে ধরা হয়েছে;

১। মুলাজোড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। ৪৩৭২ জন দূরের কথা, একজন কর্মীকেও ভি এস এস বা অন্য কোন নামে ছাঁটাই করা চলবে না।

৩। সি ই এস সি'র টি অ্যাণ্ড ডি লস, উৎপাদন খরচ ও সামগ্রিক হিসাব খতিয়ে দেখার জন্য নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করতে হবে।

# জানুয়ারিতে আন্দোলনে নামছে এস ইউ সি আই

*একের পাতার পর*

এবং তাদের কাছে প্রাপ্য কর যা আদায় করছে না তার পরিমাণ ক্যাগ রিপোর্ট অনুযায়ীই ৫৯৬৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। আমলাদের পিছনে, মন্ত্রীদের বিলাস-ব্যসনে সরকারের বহু টাকা খরচ হয়, নানা কৌশলে সরকারি তহবিলের বিপুল টাকা শাসকদলের কর্মী-বশংবদদের হাতে চলে যায়। তার ওপর পুলিশ খাতে ক্রমাগত ব্যয় বাড়ানো, মালিকশ্রেণীকে দেওয়া বিরাট ছাড় ছাড়াও ধনীদের কাছে শত শত কোটি টাকা অনাদায়ী পড়ে থাকে। এসব কারণে বাজেটে ঘাটতি হয়। অথচ এসব বিষয়ে কোন সদর্থক পদক্ষেপ না নিয়ে সি পি এম সরকার জনগণের ওপর ক্রমাগত ট্যাক্সের বোঝা চাপায়।

তিনি বলেন, মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে টাকা সংগ্রহ করা যদি যুক্তিসংগত হয়, তবে কর নিয়ে সর্বনাশা ড্রাগের ব্যবসা, নারীপাচারের ব্যবসাকেও আইনসংগত করে দেওয়া যেতে পারে !

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার কীভাবে কয়েকশো থেকে হাজারগুণ পর্যন্ত খাজনা এবং মিউটেশন সহ অন্যান্য ফি বাড়াচ্ছে তার নজির দেখিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — এই খাজনাবৃদ্ধি গ্রামের মানুষের ওপর বিপুল বোঝা হিসাবে আসবে। প্রথমত, ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গরিব চাষী যখন অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হয় তখন সরকার ন্যূনতম দাম ঘোষণা করে না। ঘোষণা করে, যখন অভাবী বিক্রি শেষ হয়ে যায়, তার পর। ফলে গরিব চাষী ধানের ন্যায্য দাম পায় না।

তিনি বলেন, এবার ধান মাঠ থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গরিব চাষীরা এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। সরকার এবং এফ সি আই চাষীদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ না করে সরাসরি মিল মালিকদের কাছ থেকে চাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার চাষীদের জন্য লাভজনক দাম নির্ধারণ না করায় বাধ্য হয়ে গরিব চাষীরা মিল মালিক নিযুক্ত দালালদের কাছে লোকসানে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গত বছর ঠিক এভাবেই অধিকাংশ ধান মিল মালিকরা জলের দামে কিনে নেওয়ার পর অনেক দেরিতে সরকার কুইন্টাল প্রতি ধানের দাম ৫৫০ টাকা ঘোষণা করে, যাতে লাভবান হয় একমাত্র ধনী চাষী, মিল মালিক ও মজুতদারেরা, আর গরিব ও মধ্যবিত্ত চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়। অন্যদিকে অতি সস্তায় ধান কিনে মিল মালিকরা স্থানীয় পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস ও সি পি এম নেতাদের যোগ-সাজসে সরকার নির্ধারিত দামে কিনেছে এই প্রমাণ দাখিল করে অত্যধিক মুনাফা লুটেছে। ক্যাগ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এভাবে সরকার মিল মালিকদের অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকার বেশি পাইয়ে দিয়েছে। এবার চাষীদের উৎপাদন ব্যয়ও অনেক বেশি হওয়ায় তাঁদের একই সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দাবি করা হয়েছে— অবিলম্বে ধানের বিক্রয়মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৬৫০ টাকা ধার্য করতে হবে।

রাজ্য সরকার এবং এফ সি আই-কে সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে সমস্ত ধান কিনে মিলকে পারিশ্রমিক দিয়ে ভাঙিয়ে নিতে হবে এবং এই চাল নির্দিষ্ট সস্তা দরে বাজারে সরবরাহ করতে হবে এবং ভরতুকি দিয়ে গরিবদের দিতে হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, ধানের ন্যূনতম দাম ঘোষণা করলেই হবে না, চাষী যাতে তা পায় তার ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হবে। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান শ্রমিকদের চরম দুর্দশা, এস ইউ সি আই এবং নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের আহ্বানে অভুক্ত চা শ্রমিকদের বিক্ষোভের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের ঘটনা কমরেড রণজিৎ ধর তুলে ধরেন।

আন্দোলনের কর্মসূচির ঘোষণায় বলা হয়, কৃষকদের ধানের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে এবং শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বেপরোয়া কর চাপানোর প্রতিবাদে আমাদের দল এস ইউ সি আই আগামী ২৩ ডিসেম্বর প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আগামী জানুয়ারি মাসে রাজ্যের প্রতিটি জেলার সদরে আইন অমান্য করা হবে এবং দাবিগুলির সমর্থনে দু'কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে। এ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার যদি জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহার না করে তবে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় কৃষক ও খেতমজুরদের মহাকরণ অভিযান-এর কর্মসূচি পালিত হবে।

### জনগণের ঘাড়ে করের বোঝা মালিকদের বিপুল ছাড়

ক) গোয়েঙ্কাকে মকুব করে দেওয়া হয়েছে — ২০৪ কোটি টাকা

খ) চালকল মালিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে — ২১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা

গ) শিল্প উৎসাহ প্রকল্পে দেওয়া হয়েছে — ৮৫৫ কোটি টাকা

ঘ) বৃহৎ মালিকদের কাছ থেকে অনাদায়ী বিক্রয় কর —৯৬-৯৭ ঃ ৩০৯ কোটি টাকা
৯৭-৯৮ ঃ ৩৪৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা
৯৮-৯৯ ঃ ৩৫০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
৯৯-২০০০ ঃ ১৩৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা
২০০০-০২ ঃ ১৭৪৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা

ঙ) বিক্রয় কর স্থির করা হয়নি, মামলায় আটকে আছে, সরকারের তাগিদ নেই — ৮০৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা

[উপরের তালিকা ক্যাগ (মার্চ, ২০০২) রিপোর্ট অনুযায়ী]

চ) গোয়েঙ্কার সি ই এস সি'র কাছে সরকারি পাওনা — ৯০০ কোটি টাকা, যা এখনও আদায় করা হয়নি

**মোট — ৫৯৬৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা**

## মদের ঢালাও লাইসেন্স

# সিপিএম নেতারা এখন না-জানার ভান করছেন

রাজ্যে বাড়তি ৩০০০ মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে, ফ্রন্ট শরিকদের কারো কারো বিরোধিতা, বিরূপ জনমত এবং এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের ডাক, এই সামগ্রিক চাপের মুখে পড়ে সি পি এম নেতা অনিল বিশ্বাস এখন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু জানা নেই। সি পি এমেরই অপর নেতা ও ফ্রন্ট-চেয়ারম্যান বিমান বসু যে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তা তো অনিল বিশ্বাসের না জানার কথা নয়! তাহলে তিনি জেনে না জানার ভান করলেন কেন? আসলে তাঁর এই অজ্ঞতার ভান নিছক একটা চালাকি। না-জানার ভান দেখিয়ে সমস্ত বিষয়টা লঘু করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল তাঁরা নিয়েছেন, যা প্রতারণারই নামান্তর।

রাজ্য সরকার এমন সিদ্ধান্ত যদি না-ই নিয়ে থাকে তবে এতবড় অভিযোগের স্পষ্ট কোন জবাব মুখ্যমন্ত্রী নিজে দিচ্ছেন না কেন? কেন তিনি বলছেন না যে সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা নেই? তা তাঁরা বলছেন না শুধু নয়, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার পর বিমান বসু "ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সরকার রাজ্যে তিন হাজারটি নতুন মদের দোকান খোলার নীতি থেকে সরছে না। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে মদের দোকান থেকে কী পরিমাণ আয় হয়, সেই তথ্যও বিমানবাবু সাংবাদিকদের সামনে হাজির করেছিলেন। নতুন মদের দোকান খোলার জন্য লাইসেন্স বিলির উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে সরকারি স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। জেলাশাসকদের নতুন তিন হাজারটি মদের দোকানের জায়গা পছন্দ করার নির্দেশও সরকারের আবগারি দফতর দিয়ে দিয়েছে" (প্রতিদিন ১৯-১২-০৩)। এত কিছু ঘটে যাওয়ার পর অনিল বিশ্বাস সম্প্রতি টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন — "মদ নিয়ে পার্টিতে কোন আলোচনা হয়নি"; তিনি বলেছেন — "কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হতে পারে তা নিয়ে বামফ্রন্টে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে আবগারি দপ্তরও রয়েছে" (গণশক্তি ১৯-১২-০৩)।

এক সপ্তাহেরও বেশি এ প্রসঙ্গে আলোচনা বাদ-প্রতিবাদ চলছে। আমাদের দলের যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও ৩ ডিসেম্বর শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মদিনটিতে সরকারি মদ্যপ্রসার কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে। এস ইউ সি আই এই সর্বনাশা সিদ্ধান্তের পিছনের শ্রেণী উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত করে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এই অবস্থায় হঠাৎ অনিল বিশ্বাস বললেন — পার্টিতে আলোচনা হয়নি, যা বাস্তবে অসত্য ভাষণ ও দ্বিচারিতা। লক্ষ করার বিষয়, সরকার এ কাজ করছে না বা পার্টি সরকারকে এ কাজে অনুমোদন দিচ্ছে না — এমন স্পষ্ট কথা তিনি বলেননি। বরং রাজস্ব বাড়াবার জন্য আবগারি দপ্তর চেষ্টা করছে এটিই তিনি বলেছেন। সংবাদে প্রকাশ, তিনি বলেছেন গোপনে মদ খাওয়া তো চলছেই। সরকার লাইসেন্স দিলে এবং সর্বত্র মদ সহজলভ্য হলে যা গোপনে চলছে তা প্রকাশ্যে চলবে। এতে আপত্তির কী আছে? অর্থাৎ অন্যায় অনুচিত কাজে মানুষের যে লজ্জা স্বাভাবিক, তা বর্জন করে নির্লজ্জভাবে সেসব কাজ করা ও প্রকাশ্যে মদ খাওয়ার পক্ষেই অনিল বিশ্বাস ওকালতি করেছেন। নীতিগতভাবে যে তাঁরা আজ মাদক প্রসারের পক্ষে এইটিই তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, তিনি এও বলেছেন যে দোকানের সংখ্যা বাড়ুক বা কমুক মদ যারা খাবার তারা খাবে, যারা খায় না, তারা খাবে না। অর্থাৎ দোকানের সংখ্যা বাড়লে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই — এটাই তিনি দেখাতে চাইছেন। পণ্য বিক্রির সঙ্গে বিপণন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। হাতের যত কাছে মদের যোগান দেওয়া হবে তত মদ্যপান বাড়বে — এটা তাঁরা ভালোই জানেন। দোকানের সংখ্যা কমা বাড়াটার যদি গুরুত্ব নাই থাকত তবে তো তাঁরা দোকান কমাতেও পারতেন। অনিল বিশ্বাসের অজুহাত সত্য হলে তাতেও মদ খাওয়া কমতো না, রাজস্বও কমত না। তাহলে তাঁরা মদের দোকান বাড়াচ্ছেন কেন? আসলে তাঁর এসব কথা দুরাত্মার ছল মাত্র। 'পার্টি এ বিষয়ে আলোচনা করেনি' একথার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত ও অসতর্ক করে দিয়ে তাঁরা সরকার ও প্রশাসনকে দিয়ে বাড়তি মদের দোকানগুলো খুলিয়ে ফেলবেন। তাদের এই কৌশল বুঝে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

# পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় নয়া শোষণের ছক

রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যেন একটা রক্তচোষা জোঁক। গ্রামীণ জনগণ শীঘ্রই এই জোঁকের নয়া শোষণের কবলে পড়তে চলেছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সচিব মানবেন্দ্রনাথ রায় এক আদেশনামায় (নং ৩৬৪৪-পি এন /ও/১/৩ - আব. - ৩/২০০১) জানিয়েছেন, গ্রামে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কুকুর পোষার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। ট্যাক্স দিতে হবে সাইকেল ব্যবহারের জন্যও। ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েতের পাকা রাস্তা, ভারী মোরাম রাস্তা বা সেতুতে পঞ্চায়েতের কর্তারা ট্যাক্স আদায় করতে পারবে। এই রাস্তা বা সেতুতে সাইকেল, রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, মোটর সাইকেল, স্কুটার, ট্র্যাক্টর প্রভৃতি যতবার যাতায়াত করবে প্রতিবারই এক টাকা করে পঞ্চায়েতি ট্যাক্স দিতে হবে।

শুরুতে এই ট্যাক্সের পরিমাণ কী হচ্ছে, তার একটি প্রাথমিক তালিকা দেওয়া হল।

তৃণভোজী প্রাণীদের মুখের গ্রাসেও ট্যাক্স বসাতে চলেছে বামফ্রন্ট। বলা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে থাকা জমিতে অর্থাৎ খাসজমি, রাস্তার দুধারে এবং সরকারি পতিত জমিতে গরু, বাছুর, মহিষ, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, ভেড়া ইত্যাদি চরানো হলে এক একটা প্রাণী পিছু ফি দিতে হবে। এখন থেকে বিনা লাইসেন্সে কুকুর, হাঁস, মুরগি পোষা যাবে না। ঐ আদেশনামায় বলা হয়েছে, পোষা কুকুর, পাখি এবং অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর জন্য লাইসেন্স ফি দিতে হবে। এবং প্রতি বছর উপযুক্ত ফি দিয়ে লাইসেন্স নবীকরণ করতে হবে। ড্রেন পরিষ্কার করা, আবর্জনা সাফাইয়ের জন্যও ট্যাক্স দিতে হবে। রাস্তায় যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে তার জন্যও ট্যাক্স গুণতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের যা দুরভিসন্ধি তাতে অদূর ভবিষ্যতে রাস্তায় টিউবওয়েলের জল খেলে তার জন্যও দাম দিতে হবে। এভাবে জনশোষণই সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের দৈনন্দিন কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে।

এই ট্যাক্সের পক্ষে সাফাই গেয়ে সি পি এম বলেছে — ঘরে পোষার জন্য কর দিতে হবে না। বাণিজ্যিক কারণে পশুপালন করলে তবেই কর দিতে হবে। তাঁরা এর দ্বারা বোঝাচ্ছেন গ্রামের গরিবদের ওপর নয়, ব্যবসায়ীদের ওপরেই তাঁরা কর বসাচ্ছেন। অথচ বাস্তব হল শখে বা ঘরে খাঁটি দুধ খাওয়ার জন্য পশুপালনের ক্ষমতা গরিবের থাকে না। গরিব মানুষ মূলত দুধ, ডিম, গরু মোষ ছাগলের বাচ্চা বিক্রি করার জন্যই পোষে। মূলত গরিব ঘরের নারীরা হাঁস মুরগি গরু ছাগলের পিছনে হাড়ভাঙা খেটে পরিবারের জন্য সামান্য যে আয় করে তাকে বাণিজ্যিক আখ্যা দিয়ে তার ওপর কর বসানোর চেষ্টা করছে সি পি এম।

মরেও নিস্তার নেই বামফ্রন্ট জমানায়। মৃতদেহ সৎকারের জন্য ৫০ টাকা ফি দিতে হবে। এছাড়া দিতে হবে কাঠ বা বিদ্যুতের দাম বাবদ ১৫০ টাকা। শ্মশানঘাট, গোরস্থান সর্বত্রই পঞ্চায়েত সদস্যরা বা তাদের মনোনীত এজেন্টরা হানাদারি চালাবে এই ফি আদায়ের জন্য।

দিতে না পারলে পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারার ৩ (১) উপধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে প্রথমবারের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হবে। এই টাকা যথাসময়ে না দিতে পারলে বকেয়াদারকে প্রতিদিন ২০ টাকা হিসাবে ফাইন দিতে হবে। সেটাও দিতে না পারলে বড় ধরনের শাস্তির জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এইভাবে পঞ্চায়েতি আইন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েতি কর্মকর্তারা গ্রামীণ জীবনে নয়া অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়ন নামিয়ে আনতে চলেছে।

যখন জমিদারি প্রথা চালু ছিল তখন প্রজাদের ওপর এভাবেই নানাবিধ ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হত। উৎপাদিত ফসলের একটা ভাল অংশ জমিদারদের ট্যাক্স হিসাবে, নজরানা হিসাবে সেদিন দিতে হত। জমিদারদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কৃষকদের সর্বস্বান্ত হতে হত। কর দিতে না পারলে জমিদারের নায়েব গোমস্তারা দৈহিক নির্যাতন চালাতো, কৃষক প্রজাদের স্ত্রী-কন্যাদের তুলে নিয়ে যেত। সেইরকমই এক শোষণের নয়া ক্ষেত্র তৈরি হতে চলেছে। শুরুতেই আন্দোলনের চাপে এই কালা নির্দেশনামা বাতিল করতে না পারলে জনগণের গলায় শোষণের নয়া ফাঁস পড়বে। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এই শোষণ নিপীড়নকে একেবারে গ্রামস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চলেছে। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা তাই আজ শোষণের বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বশাসিত শোষণের প্রতিষ্ঠান। গ্রামস্তরে পঞ্চায়েতি শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এস ইউ সি আই এই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

## জানেন কি রাজ্য সরকার কী বিপুল হারে করের বোঝা গ্রামীণ জনগণের ঘাড়ে চাপিয়েছে?

| | বিষয় | আগে যা ছিল | বর্তমানে যা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| ১। | বাইসাইকেল | কর ছিল না | ৫ টাকা (বছরে) |
| ২। | রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি গরু/মহিষ/ ঘোড়ার গাড়ি | ঐ | ২ টাকা „ |
| ৩। | ট্র্যাক্টর | ঐ | ১৫০ টাকা „ |
| ৪। | মাছ/মুরগি চাষ, ধানকল, বরফ কল, করাত কল | ঐ | ২৫০ টাকা „ |
| ৫। | টেলিফোন বুথ/ জেরক্স কেন্দ্র | ঐ | ১০০ টাকা „ |
| ৬। | গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা | ঐ | ১৪৪ টাকা „ |
| ৭। | ছাগল, ভেড়া, বাছুর | ঐ | ৭২ টাকা „ |
| ৮। | মৃতদেহ সৎকারের জন্য কবরখানা ও শ্মশানের কর | ঐ | ৫০ টাকা „ |
| ৯। | পোষা কুকুর, পাখি ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর জন্য | ঐ | ১০ টাকা „ |
| ১০। | কৃষি জমির মিউটেশন | দরখাস্ত পিছু ৭৫ পঃ | একরে ১০০ টাকা |
| ১১। | অকৃষি জমির মিউটেশন | ঐ | একরে ২০০ টাকা |
| ১২। | অবাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তন | ঐ | একরে ১০০০ টাকা |
| ১৩। | বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তন | | একরে ২০০০ টাকা |
| ১৪। | বাণিজ্যিক ফসলের জন্য ব্যবহৃত জমির খাজনা ও সেস (প্রতি একরে) | ৫ টাকা | ৭৪৪ টাকা |

## মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বীরভূম জেলা সম্মেলন

৭ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বীরভূম জেলা ৩য় সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হল বীরভূম জেলার সিউড়িতে।

নারীমুক্তি আন্দোলনের পথ প্রদর্শক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ এবং নীরবতা পালনের পর বিদায়ী সম্পাদিকা কমরেড অনিতা মুখার্জী সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সামিমা পারভিন। অনিতা মুখার্জীকে সভানেত্রী ও ইরা বোসকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করে সংগঠনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে মা-বোনেদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা সহ অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়ন-জুলুমের বিরুদ্ধে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

## কমিউনাল হারমনি কমিটির সভা

গত ৯ নভেম্বর থেকে ৮-১০ দিন ধরে আসাম, বিহার ও মহারাষ্ট্রে যেভাবে বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে গত ১২ ডিসেম্বর কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে অল বেঙ্গল কমিউনাল হারমনি কমিটির উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী জে ইসলাম। সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গীতেশ শর্মা, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, ফজলে কাদের, প্রণব ব্যানার্জী ও কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রূপম চৌধুরী।

গীতেশ শর্মা গোটা ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সুপরিকল্পিত উদাসীনতার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ যে ঘটনা ঘটাননি, সেই ঘটনায় সাধারণ মানুষকে যেভাবে নিহত হতে হয়েছে, তার দায় কোন সরকারই অস্বীকার করতে পারে না।

অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বিশ্লেষণ করে দেখান কিভাবে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত নিয়ে হানাহানি প্রশাসনিক মদতে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে আসছে। মানুষের জীবনহানি ঘটাচ্ছে। এর প্রতিবাদে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, যুব জীবনের মূল সমস্যা বেকারি মোচনের জন্য কোন উদ্যোগ না নিয়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই যুব সমাজের ঐক্যকে বিনষ্ট করার রাজনীতিই এর মূল কারণ।

ফজলে কাদের বলেন, যে বিষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে ছিল আজকের রাজনৈতিক নেতারা হীন রাজনৈতিক স্বার্থে তাকে ব্যবহার করেছেন। একে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মোকাবিলা করতে হবে।

রূপম চৌধুরী বলেন, জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ প্রদেশ নির্বিশেষে সকল শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই পারে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গামুক্ত সমাজ গড়তে। সেই লক্ষ্যেই সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

## গরিব-মারা খাজনা নীতির প্রতিবাদে নদীয়ায় আন্দোলন

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের গরিব-মারা খাজনা নীতির প্রতিবাদে গত ১০ ডিসেম্বর সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নদীয়া জেলার শিকড়া ইউনিটের উদ্যোগে শতাধিক চাষী হাটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে আর আই অফিসে ডেপুটেশনে সামিল হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ লহিরউদ্দিন, রাজ্জাক সেখ, সাহার আলি ও মওলাবক্স সর্দার। খাজনা রেহাইপ্রাপ্ত চাষীদের সার্টিফিকেট প্রদান, মকুব আওতাভুক্ত জমির মালিকের সেসসহ খাজনা মকুব ঘোষণা, ১৩৮৫ সাল থেকে ১৪০৭ সাল পর্যন্ত মকুব আওতাভুক্ত জমির মালিকের কাছ থেকে আদায়ীকৃত খাজনা ফেরত ইত্যাদি দাবিগুলি আর আই-এর কাছে পেশ করা হয়। প্রথম দাবিটি তিনি মেনে নেন এবং দ্রুত কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দেন। বাকি দাবিগুলির যৌক্তিকতা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। এই আন্দোলন আশপাশের এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

## বরানগরে বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

বরানগর পৌরসভা সংলগ্ন পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ১৪ ডিসেম্বর বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির বরানগর শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন সুনীত রুদ্র। প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কাজল ভট্টাচার্য সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন যুগ্ম আহ্বায়ক অসিত ব্যানার্জী। আইনজীবী কমলবরণ মুখার্জী নয়া বিদ্যুৎ আইনের গ্রাহকস্বার্থ বিরোধী দিকগুলি আলোচনা করে দেখান। সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির রাজ্য কমিটির পক্ষে মৃণাল সরকার বিদ্যুতের সমস্যা ও সমিতির আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মাশুলবৃদ্ধির আক্রমণ রুখবার জন্য তিনি গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার আবেদন জানান। রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সত্যেন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। নতুন কমিটির নাম প্রস্তাব করেন দিলীপ চ্যাটার্জী। সুনীত রুদ্রকে সভাপতি ও মুরারি বোসকে সম্পাদক করে ২৩ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

## ইরাক ঃ দু'টি প্রশ্ন

"... হুসেনের গ্রেপ্তার দুটি ইস্যুকে সামনে এনে দিয়েছে। প্রথমত, মুখভরা অপরিচ্ছন্ন দাড়ি ও মলিন বেশে হুসেনকে দুনিয়ার টিভির পর্দায় যেরকম নাটকীয়ভাবে দেখানো হল, তা নীতিগতভাবেই ঠিক নয়। হুসেন একজন যুদ্ধবন্দী, এবং কোনও যুদ্ধবন্দীকে প্রচারের হাতিয়ার করা যায় না, তা মানবাধিকার ও জেনেভা কনভেনশন বিরোধী। দ্বিতীয়ত, বহু মানুষই বিস্ময়ের সাথে ভাবছেন, কী হল সেই গণবিধ্বংসী অস্ত্রের। এটাই তো ছিল সাদ্দামের বিরুদ্ধে আক্রমণের মূল যুক্তি, এনিয়ে আর মার্কিন শাসকদের মুখে কোনও কথা নেই। সাদ্দাম হুসেন যেহেতু ধরা পড়েছে, সেহেতু এই যুদ্ধটা যেন ন্যায্য ছিল— এভাবেই আমেরিকা দেখাতে চায়। কিন্তু ইতিহাস আমেরিকার আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন রায় দেবে।" (দি স্টেটসম্যান, সম্পাদকীয়, ১৬-১২-০৩)

## বরাক উপত্যকাব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট

আসাম সরকার অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে চলতি শিক্ষাবর্ষে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক টিউশন ফি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথেই রাজ্যব্যাপী তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং সরকার বর্ধিত ফি আদায় করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু অতি সম্প্রতি অত্যন্ত কৌশলে কলেজগুলিতে এই বর্ধিত ফি আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে বিভিন্ন কলেজেই বিক্ষিপ্ত ভাবে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। কাছাড় কলেজে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি আদায়ে ব্যর্থ হয়। বরাক উপত্যকার সমস্ত কলেজেই এই বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এ আই ডি এস ও'র ডাকে গত ২২ নভেম্বর শিলচর গান্ধীভবনে এক ছাত্র কনভেনশনে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক শক্তিশালী 'ছাত্রস্বার্থ রক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়। প্রতিটি কলেজেই তার শাখা কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অবিলম্বে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার না করলে ২৮ নভেম্বর সমগ্র বরাক উপত্যকায় কলেজ ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আসাম রাজ্য সরকার কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করাতে ২৮ নভেম্বর সমস্ত কলেজ বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছিল টিউশন ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করা এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া। অনেক কলেজে পরীক্ষা স্থগিত রেখেও ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সর্বাত্মক কলেজ বন্‌ধের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জোরালো প্রতিবাদ জানায়।

## হাসপাতালে দুর্নীতির তদন্ত ও হাসপাতাল ভবন নির্মাণের দাবিতে নন্দীগ্রাম বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভ অবরোধ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ব্লকের ২ লক্ষ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। নন্দীগ্রাম ব্লক হাসপাতাল ভবন ৪ বছর ধরে নির্মাণ চলছে। এখন পুরনো হাসপাতালের বারান্দায় রোগীদের চিকিৎসা হয়। ওষুধপত্র তো দূরের কথা, রোগীদের টেডভ্যাকও বাজার থেকে কিনতে হয়। ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক বিক্রি, ডিউটির সময় সরকারি কোয়ার্টারে প্র্যাকটিশ করা, হাসপাতালের রোগীদের কাছ থেকে নানাভাবে টাকা নেওয়া ইত্যাদি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান ও হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালের রক্ত কেলেঙ্কারির বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নন্দীগ্রাম শাখার পক্ষ থেকে ১২ ডিসেম্বর নন্দীগ্রাম বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভ অবরোধ হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর বি ডি ও জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়। বিক্ষোভ অবরোধে নেতৃত্ব দেন ভবানী প্রসাদ দাস, সেখ আব্দুল বারেক, নন্দ পাত্র, মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

## 'আমেরিকার বিপদ বাড়ল'

"আমেরিকা এতদিন দাবি করছিল যে, সাদ্দামের হেফাজতে এখনও গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে, লুকিয়ে থাকার জন্য রক্ষী দলের প্রহরায় মাটির নিচে বিস্তৃত ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেখান থেকেই তিনি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সাদ্দাম হুসেনের ধরা পড়া আমেরিকার এই সমস্ত দাবিকেই মিথ্যা প্রমাণ করে দিল। ... সাদ্দামের অবমাননা, বিশেষ করে ইরাকিদের, সাধারণভাবে সমগ্র আরব জনগণেরই অবমাননা। ইরাক ও অন্যত্র মার্কিনী লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর একটানা হামলা দেখিয়ে দিচ্ছে, সন্ত্রাস দমনে মার্কিন প্রয়াস সফল হয়নি।

.. সাদ্দামের পুত্রদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে তাদের মৃতদেহের ছবি দুনিয়াময় দেখানো এবং এখন সাদ্দাম হুসেনের প্রকাশ্য লাঞ্ছনা — জর্জ বুশের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে আগুন ইরাকে জ্বলছে, তাতে ঘৃতাহুতির কাজ করবে।

... আগামী দিনগুলিতে আমেরিকা যদি সাদ্দামের বিচার করার নামে প্রহসন ঘটায়, তবে সন্ত্রাসের আরও ব্যাপ্তি ঘটবে। সন্ত্রাসবাদ আজ যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে আমেরিকার যত অস্ত্রই থাক, তার জোরে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ...

বিশ্বকে আরও নিরাপদ করা দূরস্থান, সাদ্দামের ধরাপড়া আমেরিকার বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।" (সম্পাদকীয়, টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ১৭-১২-০৩)

# ইরাক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার ও সাদ্দাম হুসেনের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশে মিছিল

*অবিলম্বে ইরাক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার ও সাদ্দাম হুসেনের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর বিকালে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আবদুল্লাহ সরকার, ঢাকা মহানগর বাসদ সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সাইফুর রহমান তপন। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মানববিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা অজুহাত তুলে, বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে, আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি লংঘন করে, অর্ধলক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ৯ মাস আগে ইরাক দখল করেছে। তাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বাধীনতার বুলি যে কতো বড় প্রহসন তা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। বুশ এবং ব্লেয়ার নিজ দেশেই গণবিচ্ছিন্ন অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। সাম্রাজ্যবাদীরা দালালচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করার যতো চেষ্টাই করুক না কেন ইরাকি জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশসহ বিশ্ব জনমত ইরাকি-ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে থাকবে।*

*মার্কিন দখলদারির প্রতিবাদে ও সাদ্দাম হুসেনের মুক্তির দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর মসুলে সাদ্দামের প্রতিকৃতি নিয়ে বিশাল বিক্ষোভ ছবি ঃ হিন্দুস্তান টাইমস, ১৮-১২-০৩*

## ইরাকে প্রতিরোধ চলছে

সাদ্দাম হুসেনের ধরা পড়া যে ইরাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনও পূর্ব শর্তই নয়, আরও একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বন্দি হওয়ার তিন দিন পরেও ফের রক্তাক্ত হল ইরাক। সামারা শহরে কনভয়ের উপরে হামলা ঠেকাতে মার্কিন সেনা গুলি চালালে মৃত্যু হয় ১১জন ইরাকির। ফালুজা ও রামাদিতেও সাদ্দাম সমর্থকদের বিক্ষোভ ঠেকাতে মার্কিন সেনা গুলি চালায়, মারা যান অন্তত ৫ জন ইরাকি। বস্তুত তিকরিত সহ একাধিক শহরে আজ দেখা গিয়েছে সাদ্দাম সমর্থকদের প্রতিবাদ মিছিল। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭-১২-০৩)

## প্রতিরোধ আফগানিস্তানেও

আফগানিস্তানেও আগস্ট থেকে তাদের হারানো জমি ফিরে পেতে আক্রমণ শুরু করেছে তালিবানরা। আফগান পুলিশের সঙ্গে তালিবানদের সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তালিবান সূত্রে জানা গেছে, আফগান ও বিদেশি সৈন্যের বিরুদ্ধে যাবতীয় হামলার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের পিছনে রয়েছে ১০ সদস্যের একটি গোপন কাউন্সিল। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭-১২-০৩)

## ওষুধ না খাওয়ালে ধরতে পারত না

সাদ্দাম হুসেনের কন্যা রাঘাদ বলেছেন, "সাদ্দামকে নির্যাত ওষুধ খাইয়ে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।" মার্কিন সেনার বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ করে সাদ্দামের এক বোন নাওয়াল ইব্রাহিম আল হাসান দাবি করেছেন, হেগের আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয়ে আরব ও অন্য বিদেশি আইনজীবীদের উপস্থিতিতে সাদ্দামের বিচার হওয়া উচিত। যুদ্ধ পরাধ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইরাকে বিচার হলে দ্রুত সেই প্রক্রিয়া গুটিয়ে ফেলে সাদ্দামকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং সেটা প্রহসন হবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭-১২-০৩)

# 'সাদ্দামের গ্রেপ্তার বাস্তব পরিস্থিতির কোনও বদল ঘটাচ্ছে না'

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন 'অ্যাকট নাও টু স্টপ ওয়ার অ্যাণ্ড এনড্ রেসিজম', সংক্ষেপে 'আনসার' গত ১৪ ডিসেম্বর যে বিবৃতি প্রচার করেছে, কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে তা প্রকাশ করা হল।

মার্কিন সামরিকবাহিনীর হাতে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের গ্রেপ্তারের ঘটনাকে একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত (কর্পোরেট) সংবাদমাধ্যম ও বুশ প্রশাসন উচ্চনাদে প্রচার করে বলছে, এটি একইসঙ্গে একটি বিরাট জয়, একটি নতুন যুগের সূচনা এবং ইরাক আক্রমণ ও দখল করাটা যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে তার পরিচয়।

সাদ্দাম হুসেনের গ্রেপ্তার ও তার প্রকাশ্য প্রদর্শনীর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচারে বাজিমাৎ করতে পারে, কিন্তু তাতে ইরাকের বাস্তব পরিস্থিতিতে কোনও মৌলিক বদলই ঘটছে না। ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিনী নগ্ন আগ্রাসন ও ঐ দেশ দখল যে আন্তর্জাতিক সকল আইনের ও আমেরিকার নিজস্ব আইনেরও চরম লংঘন — এই সত্যকেও তা পাল্টে দিচ্ছে না।

দীর্ঘ ৮ মাস ধরে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর সাদ্দাম হুসেনকে আটক করে ইরাকের বর্তমান যুগ্ম একনায়ক লেফটেন্যান্ট পল ব্রেমার ও লেফটেন্যান্ট রিকার্ডো স্যানচেজ যখন বলেন, এই ঘটনা ইরাকি প্রতিরোধ শেষ হওয়ার প্রারম্ভিক সংকেত দিচ্ছে, তখন তিনি সমগ্র বুশ প্রশাসনের নিছক মনোবাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

ইরাকে অবস্থানকারী কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমের খোঁজখবর রাখা সাংবাদিকরাও এমনকি বলছেন, বেআইনি ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ও দখলের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ইরাকি প্রতিরোধ — ইরাকের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা হরণের, দখলদার সেনার উত্তরোত্তর নির্মম অত্যাচারের জবাব হিসাবেই দানা বেঁধে উঠছে।

কোনও সন্দেহ নেই যে, সমস্ত দিক দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের জন্যই ইরাক দখল করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত 'ইরাক শাসন পরিষদ'-এর মাথায় রাখা হয়েছে সি আই এ-র নয়নমণি আহমেদ চালাবিকে। ১৯৫৮ সালে উৎখাত হওয়া ব্রিটিশ অধীন শাসন ব্যবস্থায় এই চালাবিরাই ছিল ইরাকের সবচেয়ে বড় ধনী পরিবার। এখন ইরাকের সমস্ত সম্পদ নিলামে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকা এখন ঔপনিবেশিক ধাঁচের পুলিশবাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ ও আধাসামরিক বাহিনী তৈরি করছে। এরা পরিবারের শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, বন্দী করে রাখছে 'জিজ্ঞাসাবাদের' সামনে নতি স্বীকারে বাধ্য করার জন্য। দেশের এক বিরাট এলাকায় তারা "ইজরায়েলি কায়দায়" গণশাস্তি চালু করেছে, সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

"ব্যাপক ভীতি ও হিংসা ছড়িয়ে এবং নানা প্রকল্পে প্রচুর অর্থ ঢেলে আমার ধারণা, এই জনগণকে বোঝাতে পারব যে ওদের সাহায্য করতেই আমরা এখানে এসেছি" — বলেছেন ইরাকে অবস্থিত একজন মার্কিন ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার (নিউইয়র্ক টাইমস, ৭.১২.০৩)। কম্যাণ্ডার কথা বলছিলেন কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা একটা গ্রামে দাঁড়িয়ে। এমন অসংখ্য গ্রামকেই কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে সেখানকার অধিবাসীদের বন্দী করে রেখেছে মার্কিনবাহিনী। এমন একটি কাঁটাতারের বেড়ার উপর ইংরাজিতে লেখা *'এই বেড়া তোমাদের রক্ষা করার জন্যই। এর কাছাকাছি যেয়ো না অথবা পার হওয়ার চেষ্টা কোরো না, তাহলে তোমাকে গুলি করা হবে।'*

বিভিন্ন দেশের সরকার ভেঙে দেওয়ার, উচ্ছেদ করার ও তার স্থানে নির্মম একনায়কতন্ত্রী শাসন বসিয়ে দেওয়ার মত জঘন্য কাজের দীর্ঘ ইতিহাস আমেরিকার রয়েছে। ইরান, কঙ্গো, গুয়াতেমালা ও চিলি ইত্যাদি দেশগুলির উদাহরণ

*সাতের পাতার পর*

## টেলিকম

# নির্লজ্জভাবে টাটা রিলায়েন্সের স্বার্থ দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার

বিপুল লাভজনক টেলিকম শিল্পে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার নামে শিল্পগোষ্ঠীগুলির নির্লজ্জ খেয়োখেয়ি এখন চরম পর্যায়ে। অপেক্ষাকৃত ছোট ও মাঝারি কোম্পানিগুলির অভিযোগ রিলায়েন্স বা টাটার মতো বৃহৎ একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সঙ্গে বেইমানি করছে। আবার বৃহৎ টেলিকম ব্যবসায়ী সরকারি সংস্থা বি এস এন এল-এর কর্মচারী ইউনিয়নগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও অবহেলার অভিযোগ এনেছে। অনেকের দৃঢ় ধারণা কর্তৃপক্ষের এই অবহেলা পরিকল্পিত ও এর পিছনে বড় আকারের দুর্নীতি আছে, একচেটিয়া বেসরকারি টেলিকম শিল্পমালিকদের হাত আছে। তারাই নিজস্ব মুনাফার স্বার্থে সরকারি টেলিকম কর্তাদের লোভনীয় টোপ দিয়ে বি এস এন এল-কে পঙ্গু করে রেখেছে। এদেরই কারসাজিতে ৩৩ কোটি টাকা খরচ করে কলকাতায় নতুন সুইচ বসানোর পরও বি এস এন এল নতুন প্রিপেড মোবাইল গ্রাহক নিচ্ছে না। অথচ সর্বত্র বি এস এন এল-এর কানেকশনের চাহিদা বাড়ছে। নদীয়া এবং কৃষ্ণনগরে কানেকশন প্রার্থীদের লাইনে এত ভিড় হয়েছিল যে, শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে লাইনের ওপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। বেশ কিছু জেলায় বি এস এন এল-এর ফর্ম কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। কর্মী ইউনিয়নগুলির চাপে বি এস এন এল কর্তারা পূর্ণ পরিকাঠামো না গড়েই এখন সামান্য সংখ্যক নতুন গ্রাহক নিতে শুরু করেছেন। তবে সংখ্যাটা খুবই কম। বাস্তবে বি এস এন এল-কে পঙ্গু করে রেখে বেসরকারি সংস্থাগুলি বাজার দখল করে নিচ্ছে। টেলিকম শিল্পের এই খেয়োখেয়ি আবারও দেখিয়ে দেয় বিশ্বপুঁজিবাদের বর্তমান চূড়ান্ত সঙ্কটের পর্যায়ে 'সুস্থ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা' বলে কিছু নেই, আছে মুনাফার লালসায় যেনতেন প্রকারেণ প্রতিযোগীদের ল্যাং মারার দৌড়। 'সুস্থ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা'র মধ্য দিয়ে প্রযুক্তির অগ্রগতি, আর্থিক বিকাশ, উপভোক্তার স্বার্থরক্ষার যেসব কথা খোলাবাজারের প্রবক্তারা দুবেলা শোনায়, পুঁজিবাদের আওতায় তা যে কেবল লোক ঠকানোর জন্য, টেলিকম শিল্পের সাম্প্রতিক কামড়া-কামড়ি তাকেই আবারও দেখিয়ে দিয়েছে।

**একীকৃত লাইসেন্স কার স্বার্থে?**

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১১ নভেম্বর ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমিউনিকেশন (ডট) একীকৃত লাইসেন্সের গাইড লাইন ঘোষণা করেছে, যাতে উল্লসিত টাটা ও রিলায়েন্স গোষ্ঠী। অন্যদিকে সেলুলার কোম্পানিগুলি এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে বটে, তবে স্থগিতাদেশ পায়নি।

১৯৯৪ সালে ভারতবর্ষে যখন মোবাইল পরিষেবা চালু হয়, তখন থেকে পৃথক পৃথক লাইসেন্সের ভিত্তিতে কোম্পানিগুলি ব্যবসা করছিল। ফিক্সড লাইন (ঘরের ফোন) এবং ডব্লু এল এল (সীমিত পাল্লার মোবাইল) এই দুয়ের ছিল পৃথক লাইসেন্স। এই লাইসেন্সধারীরা পুরনো অ্যানালগ বা আধুনিক সি ডি এম এ (কোড ডিভিশন মালটিপল অ্যাকসেস) প্রযুক্তি ব্যবহার করছিল। অন্যদিকে ছিল সেলুলার লাইসেন্স। এই লাইসেন্সধারী কোম্পানিগুলি জি এস এম (গ্লোবাল সিস্টেম অফ মোবাইল) প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরো দেশ ও বিদেশ জুড়ে পূর্ণ মোবাইল ব্যবসা করছিল। প্রথম ধরনের লাইসেন্সধারী বেসরকারি কোম্পানির মধ্যে প্রধান হল রিলায়েন্স ও টাটা। দু ধরনের লাইসেন্স নিয়েই ব্যবসা করছিল ভারতি টেলি এন্টারপ্রাইজের মতো বড় পুঁজির সংস্থা, যার আংশিক মালিকানা সিঙ্গাপুরের সিঙ্গটেল কোম্পানির হাতে রয়েছে। নিছক সেলুলার লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছিল স্পাইস, এসকোটেল, ফ্যাসেল, বি পি এল, হেক্সাকম প্রভৃতি তুলনায় ছোট ও মাঝারি কোম্পানি। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে কোটি কোটি টাকার টেলিকম ব্যবসায় সরকারি সংস্থার পাশাপাশি উপরোক্ত বেসরকারি কোম্পানিগুলি যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী বাজার ভাগাভাগি করে উচ্চ মুনাফা করছিল। দু-ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার সীমা সুনির্দিষ্ট থাকায় এসব কোম্পানির মধ্যে বড় রকম সংঘাত দেখা দেয়নি। কিন্তু ২০০০ সালে সি ডি এম এ প্রযুক্তিতে বড় রকম পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় টেলিকম ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির মালিকদের লাভের বাড়তি সুযোগ এসে যায়। এই সময়েই এদেশে বাড়তি লাভের গন্ধ পেয়ে একচেটিয়া রিলায়েন্স ও টাটা গোষ্ঠী পুরো বাজার দখল করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুঁজিবাদের স্বাভাবিক জঙ্গলের নিয়মানুযায়ী তারা সরকারের ওপর প্রভাব খাটিয়ে প্রতিযোগীদের কোণঠাসা করার এবং ছলে বলে কৌশলে বাজার থেকে হঠাবার ঘৃণ্য খেলায় নামে।

**প্রযুক্তির পরিবর্তন**

মোবাইল-টেলিশিল্পে এদেশে আজও জি এস এম প্রযুক্তির ব্যবহারই ব্যাপক। '৯৪ সালে যখন এদেশে মোবাইল পরিষেবা চালু হয়, তখন সি ডি এম এ প্রযুক্তি ছিল অসুবিধাজনক। প্রধানত আমেরিকায় ব্যবহৃত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পুঁজি লাগে প্রচুর। এই প্রযুক্তির হ্যাণ্ড সেটের দামও বেশি হওয়ায় গ্রাহকদের পক্ষে তা ব্যয়বহুল। অন্যদিকে সে সময়ে প্রধানত ইউরোপে ব্যবহৃত জি এস এম প্রযুক্তি ব্যবহারে পুঁজি লাগে তুলনায় কম, হ্যাণ্ডসেটের দামও তুলনায় কম। মোবাইল-শিল্পে লাভ প্রচুর। শুরুতে যখন মিনিটে ১৫/২০ টাকা চার্জ ছিল তখন জি এস এম কোম্পানিগুলি বিপুল মুনাফা লুটেছে, এখনও গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়ে তারা প্রভূত লাভ করছে।

কিন্তু ২০০০ সালে সি ডি এম এ প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটার সাথে সাথে একচেটিয়া গোষ্ঠী রিলায়েন্স ও টাটা, বিশেষত রিলায়েন্স বাণিজ্যিক রীতিনীতির মাথায় লাথি মেরে আগ্রাসী ভূমিকায় নেমে পড়ে। ছলে বলে কৌশলে বাজার দখলের জন্য তাদের ঘৃণ্য চেষ্টা একটানে পুঁজিবাদের মুনাফা লালসার আব্রু ঘুচিয়ে দেয়। উন্নত সি ডি এম এ-২০০০ প্রযুক্তি ব্যবহারে বিপুল পুঁজি দরকার বলে তা তুলনামূলকভাবে মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুঁজির আয়ত্তের বাইরে। জি এস এম কোম্পানিগুলি চাইলেই হঠাৎ প্রযুক্তি বদলাতেও পারবে না। তাছাড়া সি ডি এম এ-২০০০ প্রযুক্তির গ্রাহক নেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি, ফলে গ্রাহকপিছু কোম্পানির খরচ কম। একমাত্র সমস্যা দামী হ্যাণ্ডসেট যা গ্রাহককে কিনতে হবে। শেষ সমস্যাটির সমাধানে ও ছল-বল-কৌশল তিনটেই তারা কাজে লাগিয়েছে। বিপুল পুঁজি ঢেলে কিস্তিতে হ্যাণ্ডসেট দেওয়ার টোপ দিয়ে তারা গ্রাহক ধরছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটের দাম গ্রাহকদের কাছ থেকেই নিচ্ছে। তাছাড়াও নানা কৌশলে প্রকৃত কলচার্জ গোপন করে সত্যমিথ্যায় জড়ানো বিজ্ঞাপনে তারা গ্রাহক ঠকাচ্ছে। সর্বোপরি লাইসেন্সের শর্ত ভেঙে নতুন সি ডি এম এ প্রযুক্তির 'মালটিপল রেজিস্ট্রেশন' বা 'কল ফরোয়ার্ডিং' বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে মোবাইলের পাল্লা বাড়িয়ে বাস্তবে তারা পূর্ণ মোবাইলের সুবিধা দিচ্ছে। প্রতিযোগী জি এস এম কোম্পানিগুলি বলছে — এটা বেআইনি।

রিলায়েন্স অকুতোভয়। কারণ আইনের প্রণেতা ও রক্ষাকর্তা সরকার তার গোলাম, তার আজ্ঞাবহ। পুঁজিপতিগোষ্ঠীগুলির এই দ্বন্দ্বে একচেটিয়ার গোলাম ভারত সরকার টাটা, রিলায়েন্সের স্বার্থে একীকৃত লাইসেন্স চালু করতে চলেছে। অর্থাৎ বেসিক ফোন (বসানো ফোন), ডব্লু এল এল, সেলুলার — এসব ভাগ আর থাকবে না। একটিমাত্র লাইসেন্স থাকবে, যা নিয়ে সবরকম পরিষেবা দেওয়া যাবে। অর্থাৎ একীকৃত লাইসেন্সের আওতায় এসে শর্তভঙ্গের অপরাধের দায় রিলায়েন্সকে নিতে হবে না, কেবল লাইসেন্সের আওতাবৃদ্ধির জন্য ফি এবং কিছু জরিমানা দিলেই চলবে। সরকার বলছে — রিলায়েন্সকে ১৬২২ কোটি টাকা এবং টাটাকে ৭০০ কোটি টাকা দিতে হবে। এই দুই কোম্পানিই টাকা দিতে রাজি, কারণ এই টাকা দিয়ে বাস্তবে তারা ভারতের টেলিকম ব্যবসাকে প্রায় পুরোপুরি নিজেদের মুঠোয় এনে ফেলবে। এভাবেই সরকারকে হাতের মুঠোয় পুরে, টাকা ও সরকারি ক্ষমতার জোরে প্রতিযোগীদের গলা টিপে মেরে রিলায়েন্স তার স্লোগান — 'কর লো দুনিয়া মুট্ঠি মে' — বাস্তবায়িত করছে। একীকৃত লাইসেন্সের ফলাফল সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক লিখেছেন — "মনে হয় একীকৃত লাইসেন্সের ফলে ব্যবসা থেকে হঠে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। পুরো টেলিকম শিল্পে ৪ থেকে ৫টি খেলোয়াড় টিকে থাকবে। রিলায়েন্স এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বি এস এন এল অবশ্যই টিকবে। তাদের হয়ত বাড়বাড়ন্ত হবে। টাটাও মনে হয় রয়ে যাবে। হাচ মার খাবে, তবে কিছুটা বাজার ধরে রাখবে। যদি সিঙ্গটেল আরও এগিয়ে আসে তবে ভারতি, রিলায়েন্সের আর্থিক এবং প্রচারের গা-জোয়ারির মোকাবিলা খানিকটা করতে পারবে। আর বাকিরা — খুব সম্ভব — ইতিহাস হয়ে যাবে।" (আউটলুক, ১৫ নভেম্বর, অরিন্দম মুখার্জীর প্রবন্ধ)। এই মাৎস্যন্যায়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে খায়, বড় পুঁজিও তেমন গিলে খায় ছোট পুঁজিকে। সবটাই সে করে সাধারণ মানুষকে সুবিধা দেওয়ার নামে, কার্যত সে জনগণেরই রক্তশোষণ করে। নীতি তার একটাই — মুনাফা করো, যেভাবে পারো সেভাবেই।

**বি এস এন এলে অন্তর্ঘাত!**

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হাতের মুঠোয় পুরে একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠী টেলি-ব্যবসায়ের বাজার প্রায় নিষ্কণ্টক করে ফেললেও যে কাঁটাটি তাদের ভালোমতোই বিঁধছে তা হল বি এস এন এল। বেসিক, ডব্লু এল এল, সেলুলার, তিন ধরনের টেলি-পরিষেবা শুধু মহানগরীগুলিতেই নয়, জেলা শহর ও গঞ্জ এলাকাগুলিতে নিয়ে যাওয়ার মতো বিরাট পরিকাঠামো এবং অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারী, যা বি এস এন এলের আছে তা কোন বেসরকারি প্রতিযোগীর নেই। বাণিজ্যিক রীতিনীতি মেনে চললে বি এস এন এলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এদের পক্ষে এঁটে ওঠা মুশকিল। তাই তারা অন্য পথ ধরেছে। নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠছে বেসরকারি কোম্পানিগুলি বি এস এন এলের ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে। অন্তর্ঘাতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এ-যেমন সত্য, তেমন এও সত্য যে পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নেই।

কলকাতার কথাই ধরা যাক্। এখানে সি ডি এম এ এবং জি এস এম দুই প্রযুক্তিই বি এস এন এলের রয়েছে। কিন্তু তাদের সীমিত পাল্লার 'তরঙ্গ' মোবাইলের যোগাযোগ বার বার কেটে যাওয়া, শহরের সর্বত্র সমান কার্যকারিতা না থাকা প্রভৃতি ত্রুটিগুলি বছরের পর বছর পড়ে থাকছে। ফলে রিলায়েন্সের তুলনায় খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও 'তরঙ্গ' মোবাইল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। এই অবহেলা কি অনিচ্ছাকৃত? এ প্রশ্ন আজ উঠছে। জি এস এম প্রযুক্তির মোবাইলের ক্ষেত্রে উচ্চস্তর থেকে অন্তর্ঘাত আরও প্রকট।

বছর দুয়েক আগে বি এস এন এল যখন মোবাইল ব্যবসায় নামে, তার আগেই কম ব্যয়সাপেক্ষ উন্নততর সি ডি এম এ-২০০০ প্রযুক্তি এসে গিয়েছে এবং এয়ারটেল, হাচ প্রভৃতি বেসরকারি জি এস এম কোম্পানি বহু গ্রাহক করে ফেলেছে। মোবাইল ফোনের ব্যবসা দ্রুত বাড়ছে। এই অবস্থায় কলকাতার মতো শহরে মাত্র ২২০০০ গ্রাহক নেওয়ার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন সি ডট সুইচ বসানো হয়। যেখানে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সুইচ শুরুতেই বসানো উচিত ছিল — সেখানে উচ্চমহলের সিদ্ধান্তে সি-ডট সুইচ বসানোর ফলে কলকাতায় বি এস এন এল মোবাইল বাস্তবে সীমিত পাল্লার মধ্যে আটকে যায়। পরিষেবার মানও বেসরকারি কোম্পানির চেয়ে নিচু থাকে। ফলে গ্রাহকদের পকেটের পক্ষে হালকা হলেও বি এস এন এলের মোবাইলের ব্যবসা কলকাতা শহরে মার খায়। এরপর বছর খানেক ধরে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলতে থাকে যে, নতুন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সুইচ বসবে, 'সেল ওয়ান' চালু হবে, গ্রাহকরা পূর্ণ মোবাইলের সুবিধা পাবেন। প্রথমে বলা হল ১৫ আগস্ট নতুন সুইচ চালু হবে। পরে বলা হয় দেওয়ালির দিন হবে। অবশেষে পিছোতে পিছোতে নভেম্বরের গোড়ায় এক লক্ষ গ্রাহক নেওয়ার মতো ক্ষমতাশালী সুইচ চালু হয় ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বি এস এন এলের মোবাইল বিভাগ ক্যালটেলের গ্রাহক যতদিন বাইশ হাজারের আশপাশে আটকে আছে ততদিনে প্রতিযোগী বেসরকারি কোম্পানিগুলি ২ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক করেছে।

নতুন সুইচ বসানো সত্ত্বেও কেন নতুন গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে না — এ প্রশ্নের যে জবাব বি এস এন এলের কর্তারা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। নতুন সুইচের জন্য যে বাড়তি ৮৯টি টাওয়ার দরকার তা বসানোই হয়নি শুধু নয়, এজন্য উঁচু বাড়ির ছাদ ভাড়া নেওয়ার প্রাথমিক কাজটাও ফেলে রাখা হয়েছে। একে অযোগ্যতা বা অবহেলা বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ইচ্ছাকৃত অন্তর্ঘাত ছাড়া এর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই।

সন্দেহ আরও পাকাপোক্ত হয় এজন্য যে, অভিজ্ঞ ও দক্ষ বি এস এন এল কর্তাদের অবসরগ্রহণের পর প্রাইভেট মোবাইল

*সাতের পাতায় দেখুন*

## ধানের দাম পাচ্ছে না চাষীরা

# মিল মালিকদের স্বার্থে সরকার নিষ্ক্রিয়

সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে হাহাকার। ধার দেনা করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করে চাষী যে ধান ফলিয়েছে, প্রতি বছরের মতো সংগঠিত ফড়ে বাহিনী ও মিল মালিক ব্যবসায়ীদের যৌথ কারসাজিতে জলের দরে তা বিক্রি করে দিতে চাষী বাধ্য হচ্ছে। মালিকদের স্বার্থে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় থেকে সরকার এ জিনিস ঘটতে দিচ্ছে। এই সরকার নাকি গরিবের সরকার ! ফলে চাষীর মাথায় হাত। তার চিন্তা এখন একটাই — 'খাবে কী', 'সারা বছর সংসার চলবে কী করে', 'দেনা শোধের উপায় কী হবে'। চাষীর ঘরে যখন ধান ওঠে, সরকার তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করার নামে রাজ্য সরকার যতটা চাল সংগ্রহ করে, তাও করে সরাসরি চাষীর কাছ থেকে নয়, চালকল মালিকদের কাছ থেকে। চালকল মালিকরা চাষীকে নির্ধারিত মূল্য দেবে, তেমন কোন ব্যবস্থাও সরকারের নেই। ফলে চাষীর উপর নির্মম শোষণের চাকা অব্যাহতভাবেই চলতে থাকে। এ বছরও একই প্রক্রিয়া চলছে। ধানের বস্তা ২২০টাকায় বিক্রি করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চাষী বাড়ি ফিরে আসছে।

১৯৯৭-৯৮ সালের খরিপ বিপণন মরসুম (অক্টোবর মাস থেকে পরবর্তী বছরের সেপ্টে ম্বরে সমাপ্ত) থেকে চাল সংগ্রহের বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাটি রাজ্য সরকার ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার (এফ সি আই) হাত থেকে নিয়ে নেয়। এই নিয়ে অর্থনৈতিক ব্যয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্যু মূল্য (Central Issue Price)-এর মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তা প্রতিমাসে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ভরতুকি হিসাবে দিয়ে থাকে।

চাল ক্রয়ের ব্যবস্থাটির নজরদারি করবার জন্য খাদ্য এবং সরবরাহ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হলেন ডাইরেক্টর জেনারেল (খাদ্য), ২ জন সহ-অধিকর্তা (ক্রয় ও সরবরাহ) এবং ৩ জন আঞ্চ লিক সহ-অধিকর্তা (বর্ধমান, শিলিগুড়ি ও কৃষ্ণনগর)। এঁদের সহায়তায় জেলার চাল ক্রয় এবং সরবরাহ ব্যবস্থাটি তদারকি করেন জেলা সরবরাহ ও ক্রয়-এর অধিকর্তা। খাদ্য ও সরবরাহের জেলা নিয়ামক প্রতিটি জেলায় চাল ক্রয় এবং সরবরাহের কাজে যুক্ত রয়েছেন। সহ-অধিকর্তা (ক্রয়) নিয়মিতভাবে চাল ক্রয় পদ্ধ তি তদারকি করেন। অর্থ অধিকর্তা চাল ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলাগুলিতে বরাদ্দ করেন এবং ক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলির হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই হল রাজ্য সরকারের চাল কেনার মোটামুটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে চাল সংগ্রহের দায়ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জন্য অধিক পরিমাণে চাল সংগ্রহের যে গল্প রাজ্য সরকার পরিবেশন করে নিজেকে জনদরদী হিসাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে, তা যে কত অসার তা নিচের তালিকার দিকে তাকালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

| | '৯৭-'৯৮ | '৯৮-'৯৯ | '৯৯-২০০০ | ২০০০-'০১ |
|---|---|---|---|---|
| চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টন) | ৩.৫০ | ৪.৬৭ | ৪.০০ | ৮.০০ |
| অর্জিত (লক্ষ টন) | ২.০৩ | ১.২৩ | ৩.৭৪ | ৪.১৮ |
| লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিতের হার (%) | ৫৮ | ২৬ | ৯৪ | ৫২ |

(সূত্রঃ সিএজি রিপোর্ট, ২০০২)

নেওয়ার কারণ হিসাবে যা বলা হয়েছিল তা হল — এফ সি আই-এর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বি পি এলের জন্য বেশি পরিমাণ চাল সংগ্রহ করা। বি পি এল পরিবারের জন্য চাল সরবরাহের দেখা যাচ্ছে, চাল সংগ্রহের যে লক্ষ্যমাত্রা রাজ্য সরকার ধার্য করেছিল তার একটা সামান্য অংশই সংগৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এ কথা বলাই যেতে পারে, চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার একেবারেই আন্তরিক ছিল না।

যাই হোক এরপরও যতটুকু চাল রাজ্য সরকার সংগ্রহ করেছে তার দ্বারা কি পশ্চি মবঙ্গের চাষীরা লাভবান হয়েছে ? এর একটাই উত্তর — না। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার চাষীদের কাছ থেকে কোন ধান কেনেনি — চাল কিনেছে রাজ্যের ধানকল মালিকদের কাছ থেকে। এর ফল কি হয়েছে ? ক্যাগের রিপোর্ট বলছে — 'চালকল মালিকদের অনুচিতভাবে ২১.৫১ কোটি টাকা আনুকূল্য দেওয়া হয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, চাষীদের থেকে কত দামে কল মালিকরা ধান কিনেছে জেলা নিয়ামকগণ পঞ্চা য়েতের মাধ্যমে তার কোনও যাচাই করেনি।' এর একটাই অর্থ দাঁড়ায়, তা হল, ধান ওঠার পর চাষীর অভাবী বিক্রির সুযোগ নিয়ে চালকল ও ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত ফড়েরা অত্যন্ত কম দামে ধান কেনে এবং সেই ধানই চালে পরিণত হয়ে সরকারি দামে সরকারের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। এর ফল হয় দুটো। এক, সরকারি সহায়তা মিলমালিক-ব্যবসায়ীদের পুষ্ট করে ; দুই, ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চি ত চাষীর অভাবী বিক্রির চিরাচরিত প্রথা চালু থাকে, তার কোনও পরিবর্তন হয় না।

এই সামান্য বিষয়টা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞ কর্তাব্যক্তিরা জানেন না তা নয়। তবুও চাল সংগ্রহের সেই সাবেকি কংগ্রেসি প্রথা তাঁরা এখনও বলবৎ রেখেছেন এবং ক্রমাগত সেই প্রক্রিয়াকেই তাঁরা শক্তিশালী করছেন। তাই আমরা দেখছি বিরোধিতা সত্ত্বেও এ প্রক্রিয়া তাঁরা এ বছরও বলবৎ রেখেছেন। চলতি বছরের (২০০৩-০৪) ধান ও তা থেকে চাল কেনার সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় [নম্বর ২৮১৩(২) এফ এস ফুড/৪পি-২৪/২০০৩] গত অক্টোবর মাসের ২২ তারিখে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল ধান কেনা শুরু করতে হবে নভেম্বর থেকে। সাধারণ ধান প্রতি কুইন্টাল ৫৫০টাকা এবং গ্রেড-এ ৫৮০ টাকা দরে কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়। চাল বিক্রির যে দাম ধার্য করা হয়েছিল তা হল — সাধারণ আতপ প্রতি কুইন্টাল ৯৩৭.১০ টাকা এবং সাধারণ সিদ্ধ প্রতি কুইন্টাল ৯২৩.৯০ টাকা। সাধারণ আতপ চালের দাম বাড়ানো হয় ৪৬.৭০ টাকা এবং সাধারণ সিদ্ধ চালের দাম বাড়ানো হয় কুইন্টাল প্রতি ৫৬.২০ টাকা। এই প্রক্রিয়ায় সরকারি দামে চাষীদের ধানের দাম দেবার দায়িত্ব বর্তেছে চালকল মালিকদের উপর। চালকল মালিকরা এই দায়িত্ব কেমন পালন করে, তা রাজ্যের কৃষকরা ভালভাবেই জানেন।

রাজ্যের সি পি এম নেতারা অবশ্য এই ব্যবস্থার সমর্থনে জোর গলায় বলছেন — "চাষীদের সরকারি দাম না দিলে মিল মালিকদের সরকার নির্ধারিত চালের দাম পাবার কোন উপায় নেই। কারণ ধান কেনার সার্টিফিকেটে পঞ্চা য়েত সমিতির সভাপতির স্বাক্ষর প্রয়োজন। গ্রাম বাংলার খবর যারা রাখেন তাঁর ভাল করেই জানেন, পঞ্চা য়েত সমিতির সভাপতির স্বাক্ষর করা এই সার্টিফিকেট দালাল মারফত মিলমালিক-ব্যবসায়ীরা কত সহজে জোগাড় করে ফেলে এবং এইভাবে পঞ্চা য়েত-মিলমালিক-ব্যবসায়ী-প্রশাসনের দুষ্টচক্র কেমনভাবে চাষীকে বছরের পর বছর বঞ্চ না করে।

কিন্তু এই ব্যবস্থা কি চলতেই থাকবে ? এর কি কোনও সুরাহা নেই ? দীর্ঘদিন ধরেই আমরা বলে এসেছি — খাদ্যের মত এ'রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পণ্যকে কোনমতেই ব্যবসায়ীদের মুনাফার সামগ্রীতে পরিণত করা চলে না। কারণ,

*আটের পাতায় দেখুন*

# টেলিকম শিল্প

*ছয়ের পাতার পর*

কোম্পানিগুলি বিপুল বেতন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি চাকরি করে যাঁরা ২০/২৫ হাজার টাকা বেতন পেতেন, প্রাইভেট কোম্পানি তাঁদের ৬০/৮০ হাজার টাকা দিচ্ছে। এ নিশ্চ য় এমনি নয়। বেকার ইঞ্জিনিয়ারের অভাবও দেশে নেই। তবু এই বিশাল অঙ্কের টাকা তারা দিচ্ছে অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার জন্য নয়। অভিযোগ উঠেছে প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থে এঁরা নিজেদের পুরনো যোগাযোগগুলি কাজে লাগাচ্ছেন।

এই নির্লজ্জ ভ্রষ্টাচারও সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদ থেকেই জন্ম নিচ্ছে। বাণিজ্যিক রীতিনীতি মেনে 'সুস্থ প্রতিযোগিতা'র মধ্য দিয়ে শিল্প বিকাশের সুযোগ আজ আর নেই। সর্বোচ্চ মুনাফা পুঁজিবাদের সার্বজনীন নিয়ম। যতদিন পুঁজিবাদ উৎপাদন বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজার সম্প্রসারণ করতে পেরেছে ততদিন বাণিজ্যিক নিয়ম বহুলাংশে মেনেই সে সর্বোচ্চ মুনাফা করেছে। কিন্তু পুঁজির বিপুল কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়া পুঁজির জন্মের পর, উৎপাদন ক্ষমতা যত বাড়ছে, শোষণের ফলে বাজার তত বাড়ছে না। সীমিত বাজারে কয়েকটি হাতে গোনা একচেটিয়া পুঁজি মুনাফার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পুঁজির জোরে তারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কিনছে বা গ্রাহক-বন্ধু সেজে প্রলোভনের টোপ দিচ্ছে। সাথে সাথে শাসক ও সংসদীয় বিরোধী দলগুলিকে টাকা দিয়ে, নামকরা নেতাদের সময়বিশেষে ব্যক্তিগতভাবে টাকা ও সুযোগসুবিধা দিয়ে কিনে নিয়ে সরকারি ক্ষমতাকে তারা নিজস্ব মুনাফার স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। মন্ত্রীসভায় কোন্ মন্ত্রী টাটার লোক, কে রিলায়েন্সের, কে নসলি ওয়াদিয়ার — তা এখন দৈনিক সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। টেলিকম শিল্পে রিলায়েন্স-টাটা বনাম জি এস এম কোম্পানিগুলির লড়াই সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদের সেই নোংরা চেহারাটাই খুলে দেখিয়ে দেয়।

# সাদ্দামের গ্রেপ্তার বাস্তব পরিস্থিতির কোনও বদল ঘটাচ্ছে না

*পাঁচের পাতার পর*

থেকেই জানা যায় যে, কোনও সরকার গণতন্ত্রী না স্বৈরাচারী সেটা বিচার করে আমেরিকা কখনও কাউকে টার্গেট করেনি। বরং বলা যায়, চরম স্বৈরাচারি একনায়কতন্ত্র ও সামরিক শাসনকেই মার্কিন সরকার সমর্থন দিয়ে এসেছে।

ইরাকের পূর্বতন সরকারকে দানব প্রতিপন্ন করার মতলবে প্রচার চালানো হল দীর্ঘদিন। তারপরই আগ্রাসন চালিয়ে ইরাক দখল করা হল। গোটা প্রক্রিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত প্রকল্পের অঙ্গ। যার মূল কথা হল, কোন সরকার যদি ওয়াশিংটন এবং ওয়াল স্ট্রিটের হুকুমের কবল থেকে এমনকি নামেমাত্র স্বাধীনতা নিয়েও চলতে চায়, তবে আমেরিকা সেই সরকারকে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে ধ্বংস করবে। উত্তর কোরিয়া, ইরান, সিরিয়া, জিম্বাবোয়ে, কিউবা, প্যালেস্টাইন ও অন্যান্য দেশের নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য বুশ প্রশাসন বেছে নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকারেরই নগ্ন লঙ্ঘন। ইরাকি জনগণেরই একমাত্র অধিকার আছে তাদের নেতা কারা হবেন, তা স্থির করার।

পূর্বতন ইরাক সরকারের 'অপরাধে'র নমুনা হিসাবে সযত্নে বানানো যে তথ্যচিত্র শীঘ্রই বাজারে ছাড়া হবে, তা যাঁরা দেখবেন, তাঁদের খেয়ালে রাখা দরকার যে, বুশ সরকার ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ নিরীহ ইরাকি মানুষের প্রাণ নিয়েছে, ইরাককে চরম বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং যে ইরাকি জনগণ একদা কয়েক দশক ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তাদের সার্বভৌমত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকেও কেড়ে নিয়েছে।

ইরাকে মার্কিনী দখল প্রতিদিন ইরাকিদের, আমেরিকার ও 'জোটসঙ্গী' অন্যান্য দেশের মানুষের প্রাণ নিচ্ছে। হ্যালিবার্টন, বেখটেল ও অন্যান্য মার্কিন একচেটে কোম্পানিগুলি বিপুল মুনাফা লুটছে। রক্ত ও অর্থ দিয়ে যার মূল্য দিচ্ছে দেশে ও বিদেশে আমেরিকার জনগণ। সরকারি হিসাবেই ইরাকে দখলদারির ব্যয় হিসাবে প্রতিদিন ২১ কোটি ডলার যাচ্ছে। সরকার বলে দিয়েছে, প্রতিদিন কতজন ইরাকিকে তারা হত্যা করছে, সেই সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে বুশ সরকার কিছুমাত্র রাজী নয়।

আমাদের আন্দোলন চলবে, মানুষকে সমবেত করার প্রয়াস আমরা অব্যাহত রাখব। আমাদের দাবি ঃ "**দখলদারি খতম কর, এখনই সেনাদের দেশে ফিরিয়ে আনো। টাকা দিতে হবে চাকরি, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার জন্য — যুদ্ধ ও দখলের জন্য নয়।**" (নিউইয়র্ক, ১৪-১২-০৩)

http://www.International ANSWER.org

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ ৫৬ বর্ষ / ১৯ সংখ্যা ৮

# ফুটপাতই যাদের আশ্রয়

পুঁজিবাদের নির্মম শোষণ মানুষকে কেবল অনাহারেই ঠেলে দেয় না, শিক্ষা-চিকিৎসাসহ জীবনধারণের অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু থেকেও বঞ্চি ত করে তাকে গৃহহীন নিরাশ্রয় ছিন্নমূল করে দেয়। খাস কলকাতা শহরে এই গৃহহীনদের এক খণ্ডচিত্র সম্প্রতি এক সমীক্ষায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

অত্যন্ত রক্ষণশীল একটি হিসাবে প্রকাশ, দীর্ঘ ২৭ বছরে সি পি এম শাসিত পশ্চি মবঙ্গে একমাত্র কলকাতাতেই ফুটপাতে এক লক্ষেরও বেশি লোক বাস করে। এই ফুটপাতই হচ্ছে ওদের আপাত স্থায়ী ঠিকানা। এরা কেউ কুলির কাজ করে, জুতো পালিশ করে, রিক্সা চালিয়ে, ঠেলায় মাল বহন করে, দেহ মালিশ করে, কাগজ-ভাঙা টিন-প্লাস্টিক কুড়িয়ে, কেউ বড়জোর হকারি করে বা মেয়েরা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে কোনমতে দিন গুজরান করছে। খোলা আকাশের নিচে এরা কনকনে শীতে রাত কাটায়, বর্ষায় ভেজে, রোদে পোড়ে, অসুখ হলে ফুটপাতেই বিনা চিকিৎসায় মরে যায়। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে এদের বাঁচিয়ে রাখার কোন দায়িত্ব রাষ্ট্র বা সরকারের নেই। অথচ এদেরও একদিন ঘর ছিল, জমি ছিল, পরিবার ছিল। হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অথবা পুঁজিবাদের নির্মম শোষণে চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়ে তাদের আজ সব গেছে। তারা আজ ঠিকানাহীন রাস্তার লোক।

কলকাতার এই নিঃসম্বল ফুটপাতবাসীদের ৫৬ শতাংশ পুরুষ ও ৪৪ শতাংশ নারী। চরম দরিদ্র অংশের এই মানুষদের ৬৮ শতাংশই পশ্চি মবঙ্গের, বাকি অংশ অন্যান্য রাজ্যের। ৬৪ শতাংশ বরাবরের জন্য ভিটে ছেড়েছে, বাকিরা কাজের খোঁজে আসে যায়।

এই ফুটপাতবাসীরা কেউই তথাকথিত শরণার্থী নয়। এদের অনেকে ছিল ক্ষুদ্র কারিগর। অনেকেরই পূর্বপুরুষরা ছিল তাঁতি, কামার, নাপিত বা ধোপা অথবা কারখানার শ্রমিক। অনেকের জমি ছিল। গ্রামে থেকে দু-মুঠো খাদ্য জোগাড়ে ব্যর্থ হয়ে রুটির সন্ধানে কলকাতার ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অনেকেই এখনও সুস্থ জীবনের স্বপ্ন দেখে। অবশ্য সেটা স্বপ্নই।

পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়ছে, শ্রমিক-কৃষক-নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক আক্রমণ তত তীব্র হচ্ছে, তত দ্রুত এরা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। কর্মসংস্থানের সমস্ত সুযোগ এদের সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যদিও পুঁজিবাদের সংকট নিরসনে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা তথাকথিত 'বিশ্বায়ন' নীতি চালু করেছে, কিন্তু সংকটের কেশাগ্র স্পর্শ করা তো দূরের কথা, তা সংকটকে আরো তীব্র করছে — মুখে 'স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার কথা যাই বলা হোক। ফলে ফুটপাতবাসী নিঃস্ব দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এরা নিরাপত্তাহীন বিপদসংকুল জীবনের অনিশ্চ য়তায় ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছে। এদের মা-বোনদের ইজ্জত লুট হয়ে যাচ্ছে — লুট করছে সমাজবিরোধীরা বা 'নিরাপত্তারক্ষী' পুলিশরা। বহুক্ষেত্রেই তাদের অনৈতিক অন্ধকার জগতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই আবার দেশি-বিদেশি মালিকদের নয়নাভিরাম শহর গড়ার পরিকল্পনায় এই ফুটপাত থেকেও এদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে। ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে সামান্যতম স্থায়ী জীবনের ব্যবস্থাকেও। এটা যেমন ঘটছে বিজেপি-শিবসেনা-কংগ্রেস শাসিত গুজরাট, মহারাষ্ট্র, নয়া দিল্লীতে, কর্ণাটকে, তেমনি ঘটছে তথাকথিত 'বামপন্থী' শাসিত পশ্চি মবঙ্গে।

## দাম পাচ্ছেনা চাষীরা

*সাতের পাতায় পর*

খাদ্য মুনাফার সামগ্রীতে পরিণত হলে খাদ্যের উৎপাদন যারা করেন, সেই উৎপাদক কৃষকেরা লাভজনক দাম থেকে বঞ্চি ত হন, আবার চাল যাদের কিনে খেতে হয় সেই খেতমজুর সহ ব্যাপক অংশের গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষকে অনেক বেশি দাম দিয়ে খাদ্য কিনতে হয়। মাঝখান থেকে লাভ করে সামান্য কয়েকজন কোটিপতি মিলমালিক-ব্যবসায়ীরা। তাই খাদ্যশস্য বাজার জাত করার প্রক্রিয়া থেকে মিলমালিক-ব্যবসায়িক চক্রকে অপসারিত করা দরকার। কিন্তু তা সম্ভব কিভাবে ? আমরা মনে করি, এটা সম্ভব —খাদ্যদ্রব্যে পাইকারী ও খুচরা সমস্ত স্তরে ব্যক্তিগত ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করে যদি সরকার নিজেই সরাসরি ন্যায্য দামে চাষীর কাছ থেকে বিক্রয়জাত সমস্ত খাদ্যশস্য কিনে খরচ-খরচা ও নামমাত্র লাভ রেখে গরিব মানুষের মধ্যে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে, যাকে আমরা খাদ্যশস্যের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বলে বারবার উল্লেখ করেছি। চাষীর ধানের ন্যায্য দাম পাওয়া এবং গরিবের কম দামে খাদ্য পাওয়ার এই হল একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ সমাধান।

তাই খাদ্যশস্যের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুর দাবিতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য গ্রামে-গঞ্জে-শহরে সর্বত্র সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের আয়োজন করতে হবে। এছাড়া সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে দাবি আদায়ের অন্য কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত

**মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক**

**শিবদাস ঘোষ**

প্রাপ্তিস্থান

এস ইউ সি আই অফিস

৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ১৩

## মেডিকেল পড়া ও পরীক্ষায় অস্বাভাবিক ফি-বৃদ্ধি

মেডিকেল শিক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করে সুকৌশলে ছাত্রদের ঘাড়ে বিরাট ব্যয়ভার চাপানোর লক্ষ্যে পা বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের নীতি অনুযায়ী মেডিকেল শিক্ষার খরচ বাড়িয়ে শেষপর্যন্ত সেল্‌ফ ফিনান্‌সিং এডুকেশন চালু করবে অর্থাৎ, ছাত্র অভিভাবকদের ঘাড়েই বোঝা চাপাবে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রসংগঠন ডি এস ও এবং অল বেঙ্গল মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাকশন ফোরাম আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। দুটি সংগঠনের উদ্যোগে মেডিকেল ছাত্র ও শিক্ষকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে।

**ফি বৃদ্ধির পরিমাণ**

| | ছিল (টাকায়) | হতে যাচ্ছে (টাকায়) |
|---|---|---|
| ১ম এম বিবিএস পরীক্ষা | ১৪০ | ১৬০০ |
| ২য় „ | ১৪০ | ২০০০ |
| ৩য় „ পার্ট ১ | ১৪০ | ১৬০০ |
| ৩য় „ পার্ট ২ | ১৪০ | ২০০০ |
| ইনটার্নসিপ কমপ্লিশেন বুক (১০ পাতার বই) | ১০০ | ৫০০ |
| এম ডি/এম এস | — | ৫০০০ |
| ডিপ্লোমা | — | ৩০০০ |

এছাড়া সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার ফি দিতে হবে।

## গরিবদের সস্তায় চাল নয়, মদ দেবে সরকার

রাজ্যে নতুন করে ৩০০০ মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত সি পি আই (এম) নিয়েছে তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হয় না। কারণ, সি পি আই (এম) যুক্তি তুলেছে যে, রাজ্যে ঢালাও মদ বিক্রির ফলে যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে তার দ্বারা রাজ্যের দেউলিয়া অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। রাজ্যের এই শাসক দলটি এ ব্যাপারে নিশ্চি ত যে, এই রাজস্ব বৃদ্ধি যদি প্রায় দ্বিগুণ করে ১৪০০ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া যায়, তবে বাজেট ঘাটতি কিছুটা হলেও কমবে। তারা এ যুক্তিও তুলেছে যে, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু যদি মদ বিক্রি করে যথাক্রমে ১৪ হাজার, ১২ হাজার এবং ১০ হাজার কোটি টাকা তুলতে পারে, তবে বামফ্রন্ট সরকার মাত্র ৬০০ কোটি টাকায় সন্তুষ্ট থাকবে কেন। তারা তেলেগু দেশম সরকারের উদাহরণ তুলে বলেছে যে, তারা নাকি কোনরকম গণপ্রতিবাদ ছাড়াই ১০ হাজার মদের দোকান খুলতে পেরেছে। আর যে যুক্তিগুলি সি পি আই (এম) তুলছে তা হল, ব্যাপক চোলাই মদের বদলে এটি দরিদ্র মানুষের সাধ্যের মধ্যে নিরাপদ পানীয় হিসাবে কাজ করবে। ... দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষকে সস্তায় চাল দিতে না পারলেও তাদের কাছে মদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য কী উৎকণ্ঠা ! তারা কি মনে করে, দরিদ্র মানুষ তাদের প্রধান খাদ্যের একটা অংশ হিসাবে মদ খাবে ? নাকি তারা মনে করে, মদ দরিদ্র মানুষের কাছে বিপ্লবী শক্তির উদ্দীপক হিসাবে কাজ করবে ? ২৭ বছর আগে তারা যখন রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল, তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এ রাজ্যে একটি সুস্থ ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি গড়ে তুলবে, যা গোটা দেশের কাছে এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে। এখন তারা অন্যান্য রাজ্যের 'পোকায় খাওয়া বুর্জোয়া পার্টিগুলির' সমকক্ষ হতে কোথাও কুণ্ঠা বোধ করছে না।

মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত যে সমস্ত বিধি নিষেধ কাজ করত সেগুলিও তারা ইতিমধ্যেই অপসারণ করেছে। ধর্মীয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে মদের দোকান খোলার যে নিষেধাজ্ঞা ব্রিটিশ আমল এবং কংগ্রেস আমলেও ছিল, তাও তারা বাতিল করেছে এবং এ ব্যাপারে কোনও যুক্তি, কোনও প্রতিবাদকেই তারা গ্রাহ্য করেনি। ...

... ৩৭ বছর আগে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এবং কংগ্রেস প্রধান অতুল্য ঘোষকে 'কাঁচকলা প্রফুল্ল' এবং 'কানা অতুল্য' বলে তারা গালাগাল করত, যেহেতু তখন চাল অমিল হওয়ায় তাঁরা জনসাধারণকে ভাতের বদলে পুষ্টিকর কাঁচকলা এবং বেগুন খাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের অপমান করার জন্য তখন পোকায় কাটা বেগুন এবং কাঁচকলা রাস্তায় টাঙিয়ে রাখা হত। আজ মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরোধীরা যদি রাস্তায় লাইন দিয়ে মদের খালি বোতল টাঙিয়ে রাখে, তবে সি পি এম নেতাদের মনে আঘাত লাগা নিশ্চ য় উচিত নয়। (*দি স্টেটস্‌ম্যান* (১৮-১২-০৩)-এর সম্পাদকীয়'র অংশ)

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের

## পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন

**প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৩ এফ. ইউ. সি ময়দান, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, বেলা ৩টা**

**প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ,** সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই

**বক্তা ঃ কমরেড প্রতিভা মুখার্জী,** সভানেত্রী, সারা ভারত কমিটি

**কমরেড ছায়া মুখার্জী,** সাধারণ সম্পাদিকা, সারা ভারত কমিটি

**কমরেড সাধনা চৌধুরী,** সম্পাদিকা,এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

**প্রতিনিধি সম্মেলন ঃ ২৮ - ২৯ ডিসেম্বর কে. এন কলেজিয়েট স্কুল, বহরমপুর**

*সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ* suci_cc@vsnl.net